আত্মপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১৯

আমাদের পরিচয়ের একটা ভাগ আছে, যাহা একেবারে পাকা--আমার ইচ্ছা অনুসারে যাহার কোনো নড়চড় হইবার জো নাই। তাহার আর একটা ভাগ আছে যাহা আমার স্বোপার্জিত--আমার বিদ্যা ব্যবহার ব্যবসায় বিশ্বাস অনুসারে যাহা আমি বিশেষ করিয়া লাভ করি এবং যাহার পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নহে। যেমন মানুষের প্রকৃতি, তাহার একটা দিক আছে যাহা মানুষের চিরন্তন, সেইটেই তাহার ভিত্তি,--সেইখানে সে উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার প্রকৃতির আর-একটা দিক আছে যেখানে সে আপনাকে আপনি বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে--সেইখানেই একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের স্বাতন্ত্র।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সবই যদি চিরন্তন হয়, কিছুই যদি তাহার নিজে গড়িয়া লইবার না থাকে, আপনার মধ্যে কোথাও যদি সে আপনার ইচ্ছা খাটাইবার জায়গা না পায় তবে তো সে মাটির ঢেলা। আবার যদি তাহার অতীতকালের কোনো একটা চিরন্তন ধারা না থাকে তাহার সমস্তই যদি আকস্মিক হয় কিংবা নিজের ইচ্ছা অনুসারেই আগাগোড়া আপনাকে যদি তাহার রচনা করিতে হয় তবে সে একটা পাগলামি, একটা আকাশকুসুম।

মানুষের এই প্রকৃতি অনুসারেই মানুষের পরিচয়। তাহার খানিকটা পাকা খানিকটা কাঁচা, তাহার এক জায়গায় ইচ্ছা খাটে না আর এক জায়গায় ইচ্ছারই সৃজনশালা। মানুষের সমস্ত পরিচয়ই যদি পাকা হয় অথবা তাহার সমস্তই যদি কাঁচা হয় তবে দুইই তাহার পক্ষে বিপদ।

আমি যে আমারই পরিবারের মানুষ সে আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমার পরিবারের কেহ বা মাতাল, কেহ বা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া ঠেকিয়া গেল এবং লোকসমাজেও উচ্চশ্রেণীতে গণ্য হইল না। এই কারণেই আমি আমার পারিবারিক পরিচয়টাকে একেবারে চাপিয়া যাইতে পারি কিন্তু তাহা হইলে সত্যকে চাপা দেওয়া হইবে।

কিংবা হয়তো আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে কেহ কখনো হাবড়ার পুল পার হয় নাই কিংবা দুইদিন অন্তর গরম জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাই বলিয়া আমিও যে পুল পার হইব না কিংবা স্নানসম্বন্ধে আমাকে কার্পণ্য করিতেই হইবে একথা মানা যায় না।

অবশ্য, আমার সাত পুরুষে যাহা ঘটে নাই অষ্টমপুরুষে আমি যদি তাহাই করিয়া বসি, যদি হাবড়ার পুল পার হইয়া যাই তবে আমার বংশের সমস্ত মাসীপিসী ও খুড়ো-জেঠার দল নিশ্চয়ই বিস্ফারিত চক্ষুতারকা ললাটের দিকে তুলিয়া বলিবে, "তুই অমুক গোষ্ঠীতে জন্মিয়াও পুল পারাপারি করিতে শুরু করিয়াছিস! ইহাও আমাদিগকে চক্ষে দেখিতে হইল।" চাই কি লজ্জায় ক্ষোভে তাঁহাদের এমন ইচ্ছাও হইতে পারে আমি পুলের অপর পারেই বরাবর থাকিয়া যাই। কিন্তু তবু আমি যে সেই গোষ্ঠীরই ছেলে সে পরিচয়টা পাকা। মা মাসীরা রাগ করিয়া তাহা স্বীকার না করিলেও পাকা, আমি নিজে অভিমান করিয়া তাহা অস্বীকার করিলেও পাকা। বস্তুত পূর্ব-পুরুষগত যোগটা নিত্য, কিন্তু চলাফেরাসম্বন্ধে অভ্যাসটা নিত্য নহে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রাহ্মসমাজে একটা

তর্ক উঠিয়াছে। অথচ এ তর্কটা রামমোহন রায়ের মনের মধ্যে একেবারেই ছিল না দেখিতে পাই। এদিকে তিনি সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরান পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করিতেছেন, অ্যাডাম সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন ; সমাজে নিন্দায় কান পাতিবার জো নাই, তাঁহাকে সকলেই বিধর্মী বলিয়া গালি দিতেছে, এমন কি যদি কোনো নিরাপদ সুযোগ মিলিত তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোকের অভাব ছিল না,-- কিন্তু কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনো দিন লেশমাত্র সংশয় ওঠে নাই। কারণ হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে অহিন্দু বলিলেও তিনি হিন্দু এ সত্য যখন লোপ পাইবার নয় তখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোনো দরকার ছিল না।

বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা যে কী, সে লইয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমরা বলিতেছি আমরা আর কিছু নই আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সেটা তো একটা নূতন পরিচয় হইল। সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশি দূর যায় না। আমি হয়তো কেবলমাত্র গতকল্য ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছুই নাই ? অতীতকাল হইতে প্রবাহিত কোনো একটা নিত্য লক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই ?

এরূপ কোনো সম্ভবই হইতে পারে না। অতীতকে লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই ; সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না।

কথা এই, সেই আমার অতীতের পরিচয়ে আমি হয়তো গৌরব বোধ করিতে না পারি। সেটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু এইরূপ যে-সকল গৌরব পৈতৃক তাহার ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বিধাতা আমাদের সম্মতি লন না, এই সকল সৃষ্টিকার্যে কোনোরূপ ভোটের প্রথাও নাই। আমরা কেহ বা জর্মনির সম্রাটবংশে জন্মিয়াছি আবার কাহারও বা এমন বংশে জন্ম--ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে বা কালো অক্ষরে যাহার কোনো উল্লেখমাত্র নাই। ইহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়াও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতে পারি অথবা এ সম্বন্ধে কোনো গভীর তত্ত্বালোচনার চেষ্টা না করিয়া ইহাকে সহজে স্বীকার করিয়া গেলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি নাই।

অতএব, আমি হিন্দু এ কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে। কারণ, বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে সেই আপিলআদালতের জজ পাইব কোথায় ?

ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ এ সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক করেন যে, হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে মুসলমানের সঙ্গে আমার যোগ অস্বীকার করা হয়, তাহাতে ঔদার্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

বস্তুত পরিচয়মাত্রেরই এই অসুবিধা আছে। এমন কি, যদি আমি বলি আমি কিছুই না, তবে যে বলে আমি কিছুই, তাহার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে ; হয়তো সেই সূত্রেই তাহার সঙ্গে আমার মারামারি লাঠালাঠি বাধিয়া যাইতে পারে। আমি যাহা এবং আমি যাহা নই এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ আছে-- পরিচয়মাত্রই সেই বিচ্ছেদেরই পরিচয়।

এই বিচ্ছেদের মধ্যে হয়তো কোনো একপক্ষের অপ্রিয়তার কারণ আছে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াই হয়তো কোনো একজন বা একদল লোক আমার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে। এটা যদি আমি বাঞ্ছনীয় না মনে করি তবে আমার সাধ্যমতো আমার তরফ হইতে অপ্রিয়তার কারণ দূর করিতে চেষ্টা

করাই আমার কর্তব্য--যদি এটা কোনো সংগত ও উচিত কারণের উপর নির্ভর না করে, যদি অন্ধসংস্কারমাত্র হয়, তবে আমার নামের সঙ্গে সঙ্গে এই অহেতুক বিদ্বেষটুকুকেও আমার বহন করিতে হইবে। আমি রবীন্দ্রনাথ নই বলিয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াসকে কেহই প্রশংসা করিতে পারিবে না।

ইহার উত্তরে তর্ক উঠিবে, ওটা তুমি ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিলে। নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও অসুবিধা স্বতন্ত্র কথা--কিন্তু একটা বড়ো জাতির বা সম্প্রদায়ের সমস্ত দায় আমার স্বকৃত নহে সুতরাং যদি তাহা অপ্রিয় হয় তবে তাহা আমি নিঃসংকোচে বর্জন করিতে পারি।

আচ্ছা বেশ, মনে করা যাক, ইংরেজ এবং আইরিশ ; ইংরেজের বিরুদ্ধে আইরিশের হয়তো একটা বিদ্বেষের ভাব আছে এবং তাহার কারণটার জন্য কোনো একজন বিশেষ ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে বিশেষরূপে দায়ী নহে ; তাহার পূর্বপিতামহেরা আইরিশের প্রতি অন্যায় করিয়াছে এবং সম্ভবত এখনও অধিকাংশ ইংরেজ সেই অন্যায়ের সম্পূর্ণ প্রতিকার করিতে অনিচ্ছুক। এমন স্থলে যে ইংরেজ আইরিশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আইরিশকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবার জন্য বলেন না আমি ইংরেজ নই ; তিনি বাক্যে ও ব্যবহারে জানাইতে থাকেন তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুত এরূপ স্থলে স্বজাতির অধিকাংশের বিরুদ্ধে আইরিশের পক্ষ লওয়াতে স্বজাতির নিকট হইতে দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাঁহাকে সকলে গালি দিবে, তাঁহাকে Little Englander-এর দলভুক্ত ও স্বজাতির গৌরবনাশক বলিয়া সকলে নিন্দা করিবে, কিন্তু তবু এ কথা তাঁহাকে বলা সাজিবে না, আমি ইংরেজ নহি।

তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায় কিন্তু তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এই জন্যই সে পরামর্শে সত্য ফল পাওয়া যায় না। কারণ, আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই একলা তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি।

এস্থলে অপর পক্ষে বলিবেন, আমাদের আসল বাধা ধর্ম লইয়া। হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলে আমরা তাহাকে আপনার ধর্ম বলিতে পারি না। অতএব আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায় ; তাহার দ্বারা দুই কাজই হয়। এক, হিন্দুর যে ধর্ম আমার বিশ্বাসবিরুদ্ধ তাহাকে অস্বীকার করা হয় এবং যে ধর্মকে আমি জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া জানি তাহাকেও স্বীকার করিতে পারি।

এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা এই যে, হিন্দু বলিলে আমি আমার যে পরিচয় দিই, ব্রাহ্ম বলিলে সম্পূর্ণ তাহার অনুরূপ পরিচয় দেওয়া হয় না, সুতরাং একটি আর একটির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, “তুমি কি চৌধুরিবংশীয়”, আর সে, যদি তাহার উত্তর দেয়, “না আমি দপ্তরির কাজ করি,” তবে প্রশ্নোত্তরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় না। হইতে পারে চৌধুরিবংশের কেহ আজ পর্যন্ত দপ্তরির কাজ করে নাই, তাই বলিয়া তুমি দপ্তরি হইলেই যে চৌধুরি হইতে পারিবেই না এমন কথা হইতে পারে না।

তেমনি, অদ্যকার দিনে হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাই যে তাহার নিত্য লক্ষণ তাহা কখনোই সত্য নহে। এ সম্বন্ধে বৈদিককাল হইতে অদ্য পর্যন্তের ইতিহাস হইতে নজির সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিতে ইচ্ছাই করি না। আমি একটা সাধারণতত্ত্বস্বরূপেই বলিতে চাই, কোনো বিশেষ ধর্মমত ও কোনো বিশেষ আচার কোনো জাতির নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। হাঁসের পক্ষে জলে সাঁতার যেমন, মানুষের পক্ষে বিশেষ ধর্মমত কখনোই সেরূপ নহে। ধর্মমত জড় পদার্থ নহে--মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিকাশ আছে--এই জন্য ধর্ম কোনো জাতির অবিচলিত নিত্য পরিচয় হইতেই পারে না। এই জন্য যদিচ সাধারণত সমস্ত ইংরেজের ধর্ম খ্রীষ্টানধর্ম, এবং সেই ধর্মমতের উপরেই তাহার সমাজবিধি প্রধানত প্রতিষ্ঠিত তথাপি একজন ইংরেজ বৌদ্ধ হইয়া গেলে তাহার যত অসুবিধাই হউক তবু সে ইংরেজই থাকে।

তেমনি ব্রাহ্মধর্ম আপাতত আমার ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু কাল আমি প্রটেস্টান্ট পরশু রোম্যানক্যাথলিক এবং তাহার পর দিনে আমি বৈষ্ণব হইতে পারি, তাহাতে কোনো বাধা নাই, অতএব সে পরিচয় আমার সাময়িক পরিচয়,--কিন্তু জাতির দিক দিয়া আমি অতীতের ইতিহাসে এক জায়গায় বাঁধা পড়িয়াছি, সেই সুবৃহৎকালব্যাপী সত্যকে নড়াইতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই।

হিন্দুরা একথা বলে বটে আমার ধর্মটা অটল ; এবং অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহারা আমাকে অহিন্দু বলিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তাহাদের এই আচরণ আমার হিন্দু পরিচয়কে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। অনেক দিন পর্যন্ত হিন্দুমাত্রই বৈদ্যমতে ও মুসলমান হাকিমিমতে আপনাদের চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছে। এমন কি, এমন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা থাকিতে পারেন যিনি ডাক্তারি ঔষধ স্পর্শ করেন না। তথাপি অভিজ্ঞতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির চিকিৎসা-প্রণালী বিস্তার লাভ করিয়াছে। আজও ইহা লইয়া অনেকে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন যে বিদেশী চিকিৎসা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক এবং ইহাতে আমাদের শরীর জীর্ণ হইয়া গেল, দেশ উজাড় হইবার জো হইল কিন্তু তবু কুইনীনমিকশ্চার যে অহিন্দু এমন কথা কোনো তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা আজও প্রমাণের চেষ্টা হয় নাই। ডাক্তারের ভিজিটে এবং ঔষধের উগ্র উপদ্রবে যদি আমি ধনেপ্রাণে মরি তবু আমি হিন্দু এ কথা অস্বীকার করা চলিবে না। অথচ হিন্দু আয়ুর্বেদের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত খুঁজিলে ঔষধতালিকার মধ্যে কুইনীনের নাম পাওয়া যাইবে না।

এই যেমন শরীরের কথা বলিলাম, তেমনি, শরীরের চেয়ে বড়ো জিনিসেরও কথা বলা যায়। কারণ, শরীর রক্ষাই তো মানুষের একমাত্র নহে, তাহার যে প্রকৃতি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে তাহাকেও বাঁচাইয়া চলিতেই হইবে। সমাজের অধিকাংশ লোকের এমন মত হইতে পারে যে, তাহাকে বাঁচাইয়া চলিবার উপযোগী ধর্ম আয়ুর্বেদ আমাদের দেশে এমনই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো কথা চলিতে পারে না। এটা তো একটা বিশ্বাসমাত্র, এরূপ বিশ্বাস সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, অতএব যে লোকের প্রাণ লইয়া কথা সে যদি নিজের বিশ্বাস লইয়া অন্য কোনো একটা পন্থা অবলম্বন করে তবে গায়ের জোরে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি কিন্তু সত্যের জোরে পারি না। গায়ের জোরের তো যুক্তি নাই। পুলিস দারোগা যদি ঘুষ লইয়া বলপূর্বক অন্যায় করে তবে দুর্বল

বলিয়া আমি সেটাকে হয়তো মানিতে বাধ্য হইতে পারি কিন্তু সেইটেকেই রাজ্যশাসনতন্ত্রের চরম সত্য বলিয়া কেন স্বীকার করিব ? তেমনি হিন্দুসমাজ যদি ধোবানাপিত বন্ধ করিবার ভয় দেখাইয়া আমাকে বলে অমুক বিশেষ ধর্মটাকেই তোমার মানিতে হইবে কারণ এইটেই হিন্দুধর্ম--তবে যদি ভয় পাই তবে ব্যবহারে মানিয়া যাইব কিন্তু সেইটেই যে হিন্দুসমাজের চরম সত্য ইহা কোনোক্রমেই বলা চলিবে না। যাহা কোনো সভ্য সমাজেরই চরম সত্য নহে তাহা হিন্দুসমাজেরও নহে, ইহা কোটি কোটি বিরুদ্ধবাদীর মুখের উপরেই বলা যায়--কারণ, ইহাই সত্য।

হিন্দুসমাজের ইতিহাসেও ধর্মবিশ্বাসের অচলতা আমরা দেখি নাই। এখানে পরে পরে ধর্মবিপ্লব ঘটিয়াছে এমন আর কোথাও ঘটে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সকল দেবতা ও পূজা আর্যসমাজের নহে তাহাও হিন্দুসমাজে চলিয়া গিয়াছে--সংখ্যাহিসাবে তাহারাই সব চেয়ে প্রবল। ভারতবর্ষে উপাসকসম্প্রদায়সম্বন্ধে যে কোনো বই পড়িলেই আমরা দেখিতে পাইব হিন্দুসমাজে ধর্মাচরণের কেবল যে বৈচিত্র্য আছে তাহা নহে, তাহারা পাশাপাশি আছে, ইহা ছাড়া তাহাদের পরস্পরের আর কোনো ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ধর্ম হিন্দুর ধর্ম, যেটা না মানিলে তুমি আমাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিবে না ? তখন এই উত্তর পাওয়া যায়, যে-কোনো ধর্মই কিছুকাল ধরিয়া যে-কোনো সম্প্রদায়ে হিন্দুধর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ধর্মের এমনতরো জড়সংজ্ঞা আর হইতেই পারে না। যাহা শ্রেয় বা যাহার আন্তরিক কোনো সৌন্দর্য বা পবিত্রতা আছে তাহাই ধর্ম, এমন কোনো কথা নাই ;--স্তুপের মধ্যে কিছুকাল যাহা পড়িয়া আছে তাহাই ধর্ম--তাহা যদি বীভৎস হয়, যদি তাহাতে সাধারণ ধর্মনীতির সংযম নষ্ট হইতে থাকে তথাপি তাহাও ধর্ম। এমন উত্তর যতগুলি লোকে মিলিয়াই দিক্ না কেন তথাপি তাহাকে আমি আমার সমাজের পক্ষের সত্য উত্তর বলিয়া কোনোমতেই গ্রহণ করিব না। কেননা, লোক গণনা করিয়া ওজন দরে বা গজের মাপে সত্যের মূল্যনির্ণয় হয় না।

নানাপ্রকার অনার্য ও বীভৎস ধর্ম কেবলমাত্র কালক্রমে আমাদের সমাজে যদি স্থান পাইয়া থাকে তবে যে-ধর্মকে আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও ভক্তির সাধনায় আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই ধর্মদীক্ষার দ্বারা আমি হিন্দুসমাজের মধ্যে আমার সত্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব এতবড়ো অন্যায় আমরা কখনোই মানিতে পারিব না। ইহা অন্যায়, সুতরাং ইহা হিন্দুসমাজের অথবা কোনো সমাজেরই নহে।

প্রশ্ন এই, হিন্দুসমাজ যদি জড়ভাবে ভালোমন্দ সকলপ্রকার ধর্মকেই পিণ্ডাকার করিয়া রাখে এবং যদি কোনো নূতন উচ্চ আদর্শকে প্রবেশে বাধা দেয় তবে এই সমাজকে তোমার সমাজ বলিয়া স্বীকার করিবার দরকার কী ? ইহার একটা উত্তর পূর্বেই দিয়াছি--তাহা এই যে, ঐতিহাসিক দিক দিয়া আমি যে হিন্দু এ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো তর্কই নাই।

এ সম্বন্ধে আরও একটা বলিবার আছে। তোমার পিতা যেখানে অন্যায় করেন সেখানে তাহার প্রতিকার ও প্রায়শ্চিত্তের ভার তোমারই উপরে। তোমাকে পিতৃঋণ শোধ করিতেই হইবে--পিতাকে আমার পিতা নয় বলিয়া তোমার ভাইদের উপর সমস্ত বোঝা চাপাইয়া পর হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্যাকে সোজা করিয়া তোলা সত্যাচরণ নহে। তুমি বলিবে, প্রতিকারের চেষ্টা বাহির হইতে পররূপেই করিব--পুত্ররূপে নয়। কেন ? কেন বলিবে না, যে পাপ আমাদেরই সে পাপ আমরা প্রত্যেকে ক্ষালন করিব ?

জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুসমাজকে অস্বীকার করিয়া আমরা যে-কোনো সম্প্রদায়কেই তাহার স্থলে বরণ করি না কেন সে সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত দায় কি সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই গ্রহণ করিতে হয় না ? যদি কখনো দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজে বিলাসিতার প্রচার ও ধনের পূজা অত্যন্ত বেশি চলিতেছে, যদি দেখি সেখানে ধর্মনিষ্ঠা হ্রাস হইয়া আসিতেছে তবে এ কথা কখনোই বলি না যে যাহারা ধনের উপাসক ও ধর্মে উদাসীন তাহারাই প্রকৃত ব্রাহ্ম, কারণ সংখ্যায় তাহারাই অধিক, অতএব আমাকে অন্য নাম লইয়া অন্য আর-একটা সমাজ স্থাপন করিতে হইবে। তখন এই কথাই আমরা বলি এবং ইহা বলাই সাজে যে, যাঁহারা সত্যধর্ম বাক্যে ও ব্যবহারে পালন করিয়া থাকেন তাঁহারাই যথার্থ আমাদের সমাজের লোক ;-- তাঁহাদের যদি কর্তৃত্ব না-ও থাকে ভোটসংখ্যা গণনায় তাঁহারা যদি নগণ্য হন তথাপি তাঁহাদেরই উপদেশে ও দৃষ্টান্তে এই সমাজের উদ্ধার হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি সত্য ওজনদরে বা গজের মাপে বিক্রয় হয় না--তাহা ছোটো হইলেও তাহা বড়ো। পর্বতপরিমাণ খড়বিচালি স্ফুলিঙ্গপরিমাণ আগুনের চেয়ে দেখিতেই বড়ো কিন্তু আসলে বড়ো নহে। সমস্ত শেজের মধ্যে যেখানে সলিতার সূচ্যগ্র পরিমাণ মুখটিতে আলো জ্বলিতেছে সেইখানেই সমস্ত শেজটার সার্থকতা। তেলের নিম্নভাগে অনেকখানি জল আছে তাহার পরিমাণ যতই হউক সেইটেকে আসল জিনিস বলিবার কোনো হেতু নাই। সকল সমাজেই সমস্ত সমাজপ্রদীপের আলোটুকু যাঁহারা জ্বালাইয়া আছেন তাঁহারা সংখ্যাহিসাবে নহে সত্যহিসাবে সে সমাজে অগ্রগণ্য। তাঁহারা দগ্ধ হইতেছেন, আপনাকে তাঁহারা নিমেষে নিমেষে ত্যাগই করিতেছেন তবু তাঁহাদের শিখা সমাজে সকলের চেয়ে উচ্চে--সমাজে তাঁহারাই সজীব, তাঁহারাই দীপ্যমান।

অতএব, যদি এমন কথা সত্যই আমার মনে হয় যে, আমি যে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছি তাহাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে এই কথা আমাকে নিশ্চয় বলিতে হইবে এই ধর্মই আমার সমাজের ধর্ম। সমাজের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বিষয়েই সত্যকে পায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই সমাজ সিদ্ধিলাভ করে। ইস্কুলের নব্বই জনের মধ্যে নয়জন যদি পাস করে তবে সেই নয়জনের মধ্যেই ইস্কুল সার্থক। একদিন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখনকার অধিকাংশ বাঙালিপাঠকে উপহাস পরিহাস করুক আর যাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধকাব্য বাংলা সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠকাব্য। এইরুপ সকল বিষয়েই। রামমোহন রায় তাঁহার চারিদিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। একথা কোনো মতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নিচে ছিল, এবং নিচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না ? কেননা একথা সত্য নহে। কেননা তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন-- অতএব তাঁহার মহত্ব হইতে কখনোই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না--হিন্দু-সমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্‌স্‌পীয়র নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলেও তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দু-সমাজেরই সত্য মত।

অতএব, যদি সমস্ত বিপুল হিন্দুসমাজের মধ্যে কেবল মাত্র আমার সম্প্রদায়ই সত্যধর্মকে পালন করিতেছে ইহাই সত্য হয় তবে এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া সমস্ত হিন্দুসমাজ সত্যকে রক্ষা করিতেছে--তবে অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র এই পূর্বপ্রান্তে সমাজেরই অরুণোদয় হইয়াছে। আমি সেই রাত্রির অন্ধকার হইতে অরুণোদয়কে ভিন্ন কোঠায় স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব না। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভূত একাট খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে এটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দুসমাজেরই পরিণাম।

আমি জানি এ কথায় ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া বলিবেন,-- না, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সামগ্রী বলিতে পারিব না, তাহা বিশ্বের সামগ্রী। বিশ্বের সামগ্রী নয় তো কী ? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না--তাহা তো দেশ কালকে আশ্রয় করে, তাহার তো বিশেষ নামরূপ আছে। গোলাপ ফুল তো বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপফুল তো বিশেষভাবে গোলাপগাছেরই ইতিহাসের সামগ্রী, তাহা তো অশ্বত্থগাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকেই প্রকাশ করিতেছে। নহিলে তাহা নিছক পাগলামি হইয়া গঠিত,--নহিলে একজাতির সিদ্ধি আর একজাতির কোনোপ্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারিত না। ইংরেজের ইতিহাসে লড়াই কাটাকাটি মারামারি কী হইয়াছে তাহার কোন্ রাজা কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে এবং সে রাজাকে কে কবে সিংহাসনচ্যুত করিল এ সমস্ত তাহারই ইতিহাসের বিশেষ কাঠখড়-- কিন্তু এই সমস্ত কাঠখড় দিয়া সে যদি এমন কিছুই গড়িয়া না থাকে যাহা মানবচিত্তের মধ্যে দেব-সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে তবে ইংরেজের ইতিহাস একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুত বিশ্বের চিত্তশক্তির কোনো একটা দিব্যরূপ ইংরেজের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আপনাকেই অপূর্ব করিয়া ব্যক্ত করিতেছে।

হিন্দুর ইতিহাসেও সে চেষ্টার বিরাম নাই। বিশ্বসত্যের প্রকাশশক্তি হিন্দুর ইতিহাসেও ব্যর্থ হয় নাই ; সমস্ত বাধা-বিরোধও এই শক্তিরই লীলা। সেই হিন্দু-ইতিহাসের অন্তরে যে বিশ্বচিত্ত আপন সৃজনকার্যে নিযুক্ত আছেন ব্রাহ্মসমাজ কি বর্তমানযুগে তাহারই সৃষ্টিবিকাশ নহে ? ইহা কি রামমোহন রায় বা আর দুই একজন মানুষ আপন খেয়ালমতো ঘরে বসিয়া গড়িয়াছেন ? ব্রাহ্মসমাজ এই যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে হিন্দুসমাজের মাঝখানে মাথা তুলিয়া বিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল ইহার কি একেবারে কোনো মানেই নাই--ইহা কি বিশ্ববিধাতার দ্যুতক্রীড়াঘরে পাশাখেলার দান পড়া ? মানুষের ইতিহাসকে আমি তো এমন খামখেয়ালির সৃষ্টিরূপে সৃষ্টিছাড়া করিয়া দেখিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। এই বিকাশ হিন্দুসমাজের একটি

বিশ্বজনীন বিকাশ। হিন্দুসমাজের এই বিকাশটিকে আমরা কয়জনে দল বাঁধিয়া ঘিরিয়া লইয়া ইহাকে আমাদের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া চারিদিক হইতে তাহাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া তুলিব এবং মুখে বলিব এইরূপেই আমরা তাহার প্রতি পরম ঔদার্য আরোপ করিতেছি--একথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিব না।

অন্যপক্ষে আমাকে বলিবেন ভাবের দিক্ হইতে এ সমস্ত কথা শুনিতে বেশ লাগে কিন্তু কাজের বেলা কী করা যায়? ব্রাহ্মসমাজ তো কেবলমাত্র একটা ভাবের ক্ষেত্র
নহে--তাহাকে জীবনের প্রতিদিনের ব্যবহারে লাগাইতে হইবে, তখন হিন্দুসমাজের সহিত তাহার মিল করিব কেমন করিয়া?

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দুসমাজ বলিতে যদি এমন একটা পাষাণখণ্ড কল্পনা কর যাহা আজ যে অবস্থায় আছে তাহাতেই সম্পূর্ণ পরিসমাপ্ত তবে তাহার সঙ্গে কোনো সজীব মানুষের কোনোপ্রকার কারবারই চলিতে পারে না--তবে সেই পাথর দিয়া কেবলমাত্র মৃত মানবচিত্তের গোর দেওয়াই চলিতে পারে। আমাদের বর্তমান সমাজ যে কারণে যত নিশ্চল হইয়াই পড়ুক না, তথাপি তাহা সেরূপ পাথরের স্তূপ নহে। আজ, যে বিষয়ে তাহার যাহা কিছু মত ও আচরণ নির্দিষ্ট হইয়া আছে তাহাই তাহার চরম সম্পূর্ণতা নহে--অর্থাৎ সে মরে নাই। অতএব বর্তমান হিন্দু-সমাজের সমস্ত বাঁধা মত ও আচারের সঙ্গে নিজের সমস্ত মত ও আচারকে নিঃশেষে মিলাইতে পারিলে তবেই নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব একথা সত্য নহে। আমাদেরই মত ও আচারের পরিণতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। আমাদের মধ্যে কোনো বদল হইলেই আমরা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তখনই নিজেকে সমাজের বহির্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করি তবে সমাজের বদল হইবে কী করিয়া?

একথা স্বীকার করি, সমাজ একটা বিরাট কলেবর। ব্যক্তিবিশেষের পরিণতির সমান তালে সে তখনই-তখনই অগ্রসর হইয়া চলে না। তাহার নড়িতে বিলম্ব হয় এবং সেরূপ বিলম্ব হওয়াই কল্যাণকর। অতএব সেই সমাজের সঙ্গে যখন ব্যক্তিবিশেষের অমিল শুরু হয় তখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সুখকর নহে। সেই কারণে তখন তাড়াতাড়ি সমাজকে অস্বীকার করার একটা ঝোঁক আসিতেও পারে। কিন্তু যেখানে মানুষ অনেকের সঙ্গে সত্যসম্বন্ধ যুক্ত সেখানে সেই অনেকের মুক্তিতেই তাহার মুক্তি। একলা হইয়া প্রথমটা একটু আরাম বোধ হয় কিন্তু তাহার পরেই দেখা যায় যে, যে-অনেককে ছাড়িয়া দূরে আসিয়াছি দূরে আসিয়াছি বলিয়াই তাহার টান ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। যে আমারই, তাহাকে, সঙ্গে থাকিয়া উদ্ধার করিলেই, যথার্থ নিজে উদ্ধার পাওয়া যায়--তাহাকে, যদি স্বতন্ত্র নিচে ফেলিয়া রাখি তবে একদিন সেও আমাকে সেই নিচেই মিলাইয়া লইবে ; কারণ, আমি যতই অস্বীকার করি না কেন তাহার সঙ্গে আমার নানাদিকে নানা মিলনের যোগসূত্র আছে--সেগুলি বহুকালের সত্য পদার্থ। অতএব সমস্ত বাধা সমস্ত অসুবিধা স্বীকার করিয়াই আমার সমস্ত পরিবেষ্টনের মধ্যে আমার সাধনাকে প্রবর্তিত ও সিদ্ধিকে স্থাপিত করিতেই হইবে। না করিলে কখনোই তাহার সর্বাঙ্গীণতা হইবে না--সে দিনেদিনে নিঃসন্দেহই কৃশ ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে, তাহার পরিপোষণের উপযোগী বিচিত্র রস

সে কখনোই লাভ করিতে পারিবে না।

অতএব আমি যাহা উচিত মনে করিতেছি তাহাই করিব, কিন্তু একথা কখনোই বলিব না যে, সমাজের মধ্যে থাকিয়া কর্তব্যপালন চলিবে না। একথা জোর করিয়াই বলিব যাহা কর্তব্য তাহা সমস্ত সমাজেরই কর্তব্য। এই কথাই বলিব, হিন্দুসমাজের কর্তব্য আমিই পালন করিতেছি।

হিন্দুসমাজের কর্তব্য কী? যাহা ধর্ম তাহাই পালন করা। অর্থাৎ যাহাতে সকলের মঙ্গল তাহারই অনুষ্ঠান করা। কেমন করিয়া জানিব কিসে সকলের মঙ্গল? বিচার ও পরীক্ষা ছাড়া তাহা জানিবার অন্য কোনো উপায়ই নাই। বিচারবুদ্ধিটা মানুষের আছে এইজন্যই। সমাজের মঙ্গলসাধনে, মানুষের কর্তব্যনিরূপণে সেই বুদ্ধি একেবারেই খাটাইতে দিব না এমন পণ যদি করি তবে সমাজের সর্বনাশের পথ করা হয়। কেননা সর্বদা হিতসাধনের চিন্তা ও চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিলেই তবে সেই বিচারবুদ্ধি নিজের শক্তিপ্রয়োগ করিয়া সবল হইয়া উঠিতে পারে এবং তবেই, কালে কালে সমাজে স্বভাবতই যে সমস্ত আবর্জনা জমে, যে সমস্ত অভ্যাস ক্রমশই জড়ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথরোধ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে কাটাইয়া তুলিবার শক্তি সমাজের মধ্যে সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব ভ্রম ও বিপদের আশঙ্কা করিয়া সমাজকে চিরকাল চিন্তাহীন চেষ্টাহীন শিশু করিয়া রাখিলে কিছুতেই তাহার কল্যাণ হইতে পারে না।

একদা যখন নিশ্চিত তখন নিজের দৃষ্টান্ত ও শক্তিদ্বারাই সমাজের মধ্যে এই মঙ্গলচেষ্টাকে সজীব রাখা নিতান্তই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। যাহা ভালো মনে করি তাহা করিবার জন্য কখনোই সমাজ ত্যাগ করিব না।

আমি দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেছি, জাতিভেদ। যদি জাতিভেদকে অন্যায় মনে করি তবে তাহা নিশ্চয়ই সমস্ত হিন্দুসমাজের পক্ষে অন্যায়--অতএব তাহাই যথার্থ অহিন্দু। কোনো অন্যায় কোনো সমাজেরই পক্ষে নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। যাহা অন্যায় তাহা ভ্রম, তাহা স্খলন, সুতরাং তাহাকে কোনো সমাজেরই চিরপরিণাম বলিয়া গণ্য করা একপ্রকার নাস্তিকতা। আগুনের ধর্মই যেমন দাহ, অন্যায় কোনো সমাজেরই সেরূপ ধর্ম হইতেই পারে না। অতএব হিন্দু থাকিতে গেলে আমাকে অন্যায় করিতে হইবে অধর্ম করিতে হইবে একথা আমি মুখে উচ্চারণ করিতে চাই না। সকল সমাজেই বিশেষ কালে কতকগুলি মনুষ্যত্বের বিশেষ বাধা প্রকাশ পায়। যে সকল ইংরেজ মহাআরা জাতিনির্বিচারে সকল মানুষের প্রতিই ন্যায়াচরণের পক্ষপাতী, যাঁহারা সকল জাতিরই নিজের বিশেষ শক্তিকে নিজ নিজ পন্থায় স্বাধীনতার মধ্যে পূর্ণ বিকশিত দেখিতে ইচ্ছা করেন--তাঁহারা অনেকে আক্ষেপ করিতেছেন বর্তমানে ইংরেজজাতির মধ্যে সেই উদার ন্যায়পরতার, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার, সেই মানবপ্রেমের খর্বতা ঘটিয়াছে--কিন্তু তাই বলিয়াই এই দুর্গতিকে তাঁহারা নিত্য বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। তাই তাঁহারা ইহারই মাঝখানে থাকিয়া নিজের উদার আদর্শকে সমস্ত বিদ্রূপ ও বিরোধের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন--তাঁহারা স্বজাতির বাহিরে নূতন একটা জাতির সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন নাই।

তেমনি, জাতিভেদকে যদি হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর বলিয়া জানি তবে তাহাকেই আমি অহিন্দু বলিয়া জানিব এবং হিন্দুসমাজের মাঝখানে থাকিয়াই তাহার সঙ্গে লড়াই করিব। ছেলেমেয়ের অসবর্ণ বিবাহ দিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না এবং তাহাকেই আমি নিজে হইতে অহিন্দুবিবাহ বলিব না--কারণ বস্তুত আমার মতানুসারে তাহাই হিন্দুবিবাহনীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যদি এমন হয় যে, হিন্দুসমাজের পক্ষে জাতিভেদ ভালোই, কেবলমাত্র আমাদের কয়েকজনের পক্ষেই তাহার অসুবিধা বা অনিষ্ট আছে তবেই এই ক্ষেত্রে আমার পক্ষে স্বতন্ত্র হওয়া শোভা পায় নতুবা কদাচ নহে।

হিন্দুসমাজে কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ ছিল না এ কথা সত্য নহে, কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে না ইহাও সত্য নহে--হিন্দুসমাজের সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়া যে সমাজ, সেই বর্তমান সমাজকেই একমাত্র সত্য বলিয়া তাহায় আশা ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা অস্বীকার করিয়া দূরে চলিয়া যাওয়াকে আমি ধর্মসংগত বলিয়া কখনোই মনে করি না।

অপর পক্ষ বলিবেন আচ্ছা বেশ, বর্তমানের কথাই ধরা যাক, আমি যদি জাতিভেদ না মানিতেই চাই তবে এ সমাজে কাজকর্ম করিব কাহার সঙ্গে ? উত্তর, এখনও যাহাদের সঙ্গে করিতেছ। অর্থাৎ যাহারা জাতিভেদ মানে না।

তবেই তো সেই সূত্রে একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়িয়া উঠিল। না, ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে ইহা সম্প্রদায় মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের স্থান সম্প্রদায় জুড়িতে পারে না। আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি--ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া ? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কী করিয়া ?

তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার ? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান। খ্রীস্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীস্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ--কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা--তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি--এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ।

হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু

হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাতপরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীস্টান হইয়াছিলেন বলিয়াই এই সুগভীর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কী করিয়া ? জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক অন্তরতর ; মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না।ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিসম্বন্ধে কোনো একটা পৌরাণিক মতকে যখন আমি বিশ্বাস করিতাম তখনও আমি যে জাতি ছিলাম তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত যখন বিশ্বাস করি তখনও আমি সেই জাতি। যদিচ আজ ব্রহ্মাণ্ডকে আমি কোনো অণ্ডবিশেষ বলিয়া মনে করি না ইহা জানিতে পারিলে এবং সুযোগ পাইলে আমার প্রপিতামহ এই প্রকার অদ্ভুত নব্যতায় নিঃসন্দেহ আমার কান মলিয়া দিতেন।

কিন্তু চীনের মুসলমানও মুসলমান, পারস্যেরও তাই, আফ্রিকারও তদ্রূপ। যদিচ চীনের মুসলমানসম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না তথাপি এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের ধর্মমতের অনেকটা হয়তো মেলে কিন্তু অন্য অসংখ্য বিষয়েই মেলে না। এমন কি, ধর্মমতেরও মোটামুটি বিষয়ে মেলে কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ে মেলে না। অথচ হাজার হাজার বিষয়ে তাহার স্বজাতি কন্‌ফ্যুসীয় অথবা বৌদ্ধের সঙ্গে তাহার মিল আছে। পারস্যে চীনের মতো কোনো প্রাচীনতর ধর্মমত নাই বলিলেই হয়। মুসলমান বিজেতার প্রভাবে সমস্ত দেশে এক মুসলমান ধর্মই স্থাপিত হইয়াছে তথাপি পারস্যে মুসলমান ধর্ম সেখানকার পুরাতন জাতিগত প্রকৃতির মধ্যে পড়িয়া নানা বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে--আজ পর্যন্ত কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

ভারতবর্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এখানেও আমার জাতি-প্রকৃতি আমার মতবিশেষের চেয়ে অনেক ব্যাপক। হিন্দুসমাজের মধ্যেই তাহার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। যে সকল আচার আমাদের শাস্ত্রে এবং প্রথায় অহিন্দু বলিয়া গণ্য ছিল আজ কত হিন্দু তাহা প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে ; কত লোককে আমরা জানি যাঁহারা সভায় বক্তৃতা দিবার ও কাগজে প্রবন্ধ লিখিবার বেলায় আচারের স্খলন লেশমাত্র সহ্য করিতে পারেন না অথচ যাঁহাদের পানাহারের তালিকা দেখিলে মনু ও পরাশর নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন এবং রঘুনন্দন আনন্দিত হইবেন না। তাঁহাদের প্রবন্ধের মত অথবা তাঁহাদের ব্যাবহারিক মত, কোনো মতের ভিত্তিতেই তাঁহাদের হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার ভিত্তি আরও গভীর। সেই জন্যই হিন্দুসমাজে আজ যাঁহারা আচার মানেন না, নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাঁহারা ভাটপাড়ার বিধান রক্ষা করেন না, এবং গুরু বাড়ি আসিলে গুরুতর কাজের ভিড়ে যাঁহাদের অনবসর ঘটে, তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেছেন। তাহার একমাত্র কারণ এ নয় যে হিন্দুসমাজ দুর্বল--তাহার প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত বাঁধাবাঁধির মধ্যেও হিন্দুসমাজ একপ্রকার অর্ধচেতন ভাবে অনুভব করিতে পারে যে, বাহিরের এই সমস্ত পরিবর্তন হাজার হইলেও তবু বাহিরের--যথার্থ হিন্দুত্বের সীমা এইটুকুর মধ্যে কখনোই বদ্ধ নহে।

যে কথাটা সংকীর্ণ বর্তমানের উপস্থিত অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া বৃহৎভাবে সত্য, অনেক পাকা লোকেরা তাহার উপরে কোনো আস্থাই রাখেন না। তাঁহারা মনে করেন এ সমস্ত নিছক আইডিয়া। মনে করেন করুন কিন্তু আমাদের সমাজে আজ এই আইডিয়ার প্রয়োজনই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন। এখানে জড়ত্বের আয়োজন যথেষ্ট আছে যাহা পড়িয়া থাকে, বিচার করে না, যাহা অভ্যাসমাত্র, যাহা নড়িতে চায় না তাহা এখানে যথেষ্ট আছে, এখানে কেবল সেই তত্ত্বেরই অভাব দেখিতেছি, যাহা সৃষ্টি করে, পরিবর্তন করে, অগ্রসর করে, যাহা বিচিত্রকে অন্তরের দিক হইতে মিলাইয়া এক করিয়া দেয়। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সেই আইডিয়াকেই জন্ম দিয়াছে, যাহা তাহাকে উদ্বোধিত করিবে ; যাহা তাহাকে চিন্তা করাইবে, চেষ্টা করাইবে, সন্ধান করাইবে ; যাহা তাহার নিজের ভিতরকার সমস্ত অনৈক্যকে সত্যের বন্ধনে এক করিয়া বাঁধিয়া তুলিবার সাধনা করিবে, যাহা জগতের সমস্ত প্রাণশক্তির সঙ্গে তাহার প্রাণক্রিয়ার যোগসাধন করিয়া দিবে। এই যে আইডিয়া, এই যে সৃজনশক্তি, চিত্তশক্তি, সত্যগ্রহণের সাধনা, এই যে প্রাণচেষ্টার প্রবল বিকাশ, যাহা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আকার গ্রহণ করিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজের বলিয়া অস্বীকার করিব ? যেন আমরাই তাহার মালেক, আমরাই তাহার জন্মদাতা। হিন্দুসমাজের এই নিজেরই ইতিহাসগত প্রাণগত সৃষ্টি হইতে আমরা হিন্দুসমাজকেই বঞ্চিত করিতে চাহিব ? আমরা হঠাৎ এত বড়ো অন্যায় কথা বলিয়া বসিব যে, যাহা নিশ্চল, যাহা বাধা, যাহা প্রাণহীন তাহাই হিন্দুসমাজের, আর যাহা তাহার আইডিয়া, তাহার মানসরূপ, তাহার মুক্তির সাধনা, তাহাই হিন্দু-সমাজের নহে, তাহাই বিশ্বের সরকারি জিনিস। এমন করিয়া হিন্দুসমাজের সত্যকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টাই কি ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা ?

এত দূর পর্যন্ত আসিয়াও আমার শ্রোতা বা পাঠক যদি একজনও বাকি থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয় আমাকে শেষ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন যদি জাতিভেদ না মানিয়াও হিন্দুত্ব থাকে, যদি মুসলমান খ্রীস্টান হইয়াও হিন্দুত্ব না যায় তবে হিন্দুত্বটা কী ? কী দেখিলে হিন্দুকে চিনিতে পারি ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি আমি বাধ্য হই তবে নিশ্চয়ই তিনিও বাধ্য। হিন্দুত্ব কী--ইহার যে-কোনো উত্তরই তিনি দিন না, বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও তাহার প্রতিবাদ আছে। শেষকালে তাঁহাকে এই কথাই বলিতে হইবে, যে সম্প্রদায় কিছুদিন ধরিয়া যে ধর্ম এবং যে আচারকেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে তাহাই তাহার পক্ষে হিন্দুত্ব এবং তাহার ব্যতিক্রম তাহার পক্ষেই হিন্দুত্বের ব্যতিক্রম। এই কারণে যাহাতে বাংলার হিন্দুত্ব দূষিত হয় তাহাতে পাঞ্জাবের হিন্দুত্ব দূষিত হয় না, যাহা দ্রাবিড়ের হিন্দুর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে তাহা কান্যকুব্জের হিন্দুর পক্ষে লজ্জাজনক।

বাহিরের দিক হইতে হিন্দুকে বিচার করিতে গেলেই এত বড়ো একটা অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিতে হয়। কিন্তু বাহিরের দিক হইতেই এইরূপ বিচার করাটাই অবিচার ;--সেই অবিচারটা হিন্দুসমাজ স্বয়ং নিজের প্রতি নিজে প্রয়োগ করিয়া থাকে বলিয়াই যে সেটা তাহার যথার্থ প্রাপ্য একথা আমি স্বীকার করি না। আমি নিজেকে নিজে যাহা বলিয়া জানি তাহা যে প্রায়ই সত্য হয় না একথা কাহারও অগোচর নাই।

মানুষের গভীরতম ঐক্যটি যেখানে, সেখানে কোনো সংজ্ঞা পৌঁছিতে পারে না--কারণ সেই ঐক্যটি জড়বস্তু নহে তাহা জীবনধর্মী। সুতরাং তাহার মধ্যে যেমন একটা স্থিতি আছে তেমনি একটা গতিও

আছে। কেবলমাত্র স্থিতির দিকে যখন সংজ্ঞাকে খাড়া করিতে যাই তখন তাহার গতির ইতিহাস তাহার প্রতিবাদ করে--কেবলমাত্র গতির উপরে সংজ্ঞাকে স্থাপন করাই যায় না, সেখানে সে পা রাখিবার জায়গাই পায় না।

এই জন্যই জীবনের দ্বারা আমরা জীবনকে জানিতে পারি কিন্তু সংজ্ঞার দ্বারা তাহাকে বাঁধিতে পারি না। ইংরেজের লক্ষণ কী, যদি সংজ্ঞা নির্দেশের দ্বারা বলিতে হয় তবে বলিতেই পারিব না--এক ইংরেজের সঙ্গে আর এক ইংরেজের বাধিবে--এক যুগের ইংরেজের সঙ্গে আর এক যুগের ইংরেজের মিল পাইব না। তখন কেবলমাত্র এই একটা মোটা কথা বলিতে পারিব যে, এক বিশেষ ভূখণ্ড ও বিশেষ ইতিহাসের মধ্যে এই যে জাতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষ হইয়াছে এই জাতি আপন ব্যক্তিগত কালগত সমস্ত বৈচিত্র্য লইয়াও এক ইংরেজজাতি। ইহাদের মধ্যে যে খ্রীষ্টান সেও ইংরেজ, যে কালীকে মানিতে চায় সেও ইংরেজ ; যে পরজাতির উপরে নিজের আধিপত্যকে প্রবল করিয়া তোলাকেই দেশহিতৈষিতা বলে সেও ইংরেজ এবং যে এইরূপে অন্য জাতির প্রতি প্রভুত্বচেষ্টা দ্বারা স্বজাতির চরিত্রনাশ হয় বলিয়া উৎকণ্ঠিত হয় সেও ইংরেজ,-- যে ইংরেজ নিজেদের মধ্যে কাহাকেও বিধর্মী বলিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছে সেও ইংরেজ এবং যে লোক সেই বিধর্মকেই সত্যধর্ম বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে সেও ইংরেজ। তুমি বলিবে ইহারা সকলেই আপনাকে ইংরেজ বলিয়া মনে করে সেইখানেই ইহাদের যোগ ; কিন্তু শুধু তাই নয়, মনে করিবার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে ; ইহারা যে যোগ-সম্বন্ধে প্রত্যেকে সচেতন তাহারই একটি যোগের জাল আছে। সেই জালটিতে সকল বৈচিত্র্য বাঁধা পড়িয়াছে। এই ঐক্যজালের সূত্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করাই যায় না অথচ তাহা স্থূলবন্ধনের চেয়ে দৃঢ়।

আমাদের মধ্যেও তেমনি একটি ঐক্যজাল আছে। জানিয়া এবং না জানিয়াও তাহা আমাদের সকলকে বাঁধিয়াছে। আমার জানা ও স্বীকার করার উপরেই তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। কিন্তু তথাপি আমি যদি তাহাকে জানি ও স্বীকার করি তবে তাহাতে আমারও জোর বাড়ে তাহারও জোর বাড়ে। এই বৃহৎ ঐক্যজালের মহত্ত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে যদি মূঢ়তার ফাঁদ করিয়া তুলি তবে সত্যকে খর্ব করার যে শাস্তি তাহাই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। যদি বলি, যে লোক দক্ষিণ শিয়রে মাথা করিয়া শোয় সেই হিন্দু, যে অমুকটা খায় না এবং অমুককে ছোঁয় না সেই হিন্দু, যে লোক আট বছরের মেয়েকে বিবাহ দেয় এবং সবর্ণে বিবাহ করে সেই হিন্দু তবে বড়ো সত্যকে ছোটো করিয়া আমরা দুর্বল হইব, ব্যর্থ হইব, নষ্ট হইব।

এই জন্যই, যে আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি সেই আমার এ কথা নিশ্চয়রূপে জানা কর্তব্য, জ্ঞানে ভাবে কর্মে যাহা কিছু আমার শ্রেষ্ঠ তাহা একলা আমার নহে, তাহা একলা আমার সম্প্রদায়েরও নহে তাহা আমার সমস্ত সমাজের। আমার মধ্য দিয়া আমার সমস্ত সমাজ তপস্যা করিতেছে--সেই তপস্যার ফলকে আমি সেই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মানুষকে বাদ দিয়া কোনো সমাজ নাই, এবং যাহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ তাহারাই মানুষের প্রতিনিধি, তাহাদের দ্বারাই সমস্ত মানুষের বিচার হয়। আজ আমাদের সম্প্রদায়ই যদি জ্ঞানে ও আচরণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকে তবে আমাদের সম্প্রদায়ের দ্বারাই ইতিহাসে সমস্ত হিন্দুসমাজের বিচার হইবে এবং সে বিচার সত্য বিচারই হইবে। অতএব হিন্দুসমাজের

দশজন যদি আমাকে হিন্দু না বলে এবং সেই সঙ্গে আমিও যদি আমাকে হিন্দু না বলি তবে সে বলামাত্রের দ্বারা তাহা কখনোই সত্য হইবে না। সুতরাং ইহাতে আমাদের কোনো পক্ষেরই কোনো ইষ্ট নাই। আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই--এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশতবৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষ ভাবে উপাদেয়, আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। আছে বলিয়াই সত্যের এই রূপটিকে--এই রসটিকে মানুষ কেবল এখান হইতে পাইতে পারে। ব্রাহ্ম সমাজের সাধনাকে আমরা অন্ধ অহংকারে নূতন বলিতেছি কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি সত্য অহংকারে বলিব ইহা আমাদেরই ভিতরকার চিরন্তন--নবযুগে নববসন্তে সেই আমাদের চিরপুরাতনেরই নূতন বিকাশ হইয়াছে। য়ুরোপে খ্রীস্টান ধর্ম সেখানকার মানুষের কর্মশক্তি হইতে একটি বিশ্বসত্যের বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। সেইজন্য খ্রীস্টানধর্ম নিউটেস্টামেন্টের শাস্ত্রলিখিত ধর্ম নহে ইহা য়ুরোপীয় জাতির সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট জীবনের ধর্ম ; একদিকে তাহা য়ুরোপের অন্তরতম চিরন্তন, অন্য দিকে তাহা সকলের। হিন্দুসমাজের মধ্যেও আজ যদি কোনো সত্যের জন্ম ও প্রচার হয় তবে তাহা কোনোক্রমেই হিন্দুসমাজের বাহিরের জিনিস হইতেই পারে না,--যদি তাহা আমাদের চিরদিনের জীবন হইতে জীবন না পাইয়া থাকে, যদি সেইখান হইতেই তাহার স্তন্যরস না জুটিয়া থাকে, আমাদের বৃহৎ সমাজের চিত্তবৃত্তি যদি ধাত্রীর মতো তাহার সেবা না করিয়া থাকে তবে কেবল আমাদের হিন্দুসমাজে নহে পৃথিবীর কোনো সমাজেই এই পথের ধারের কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস শ্রদ্ধার যোগ্য হয় নাই--তবে ইহা কৃত্রিম, ইহা অস্বাভাবিক, তবে সত্যের চির অধিকারসম্বন্ধে এই দরিদ্রের কোনো নিজের বিশেষ দলিল দেখাইবার নাই, তবে ইহা কেবল ক্ষণকালের সম্প্রদায়ের, ইহা চিরকালের মানবসমাজের নহে।

আমি জানি কোনো কোনো ব্রাহ্ম এমন বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুর কাছে যাহা পাইয়াছি, খ্রীস্টানের কাছে তাহার চেয়ে কম পাই নাই--এমন কি, হয়তো তাঁহারা মনে করেন তাহার চেয়ে বেশি পাইয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, বাহির হইতে যাহা পাই তাহাকেই আমরা পাওয়া বলিয়া জানিতে পারি--কেননা, তাহাকে চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় এবং তাহার প্রত্যেক অংশকে অনুভব করিয়া করিয়া পাই। এই জন্য বেতনের চেয়ে মানুষ সামান্য উপরি পাওনায় বেশি খুশি হইয়া উঠে। আমরা হিন্দু বলিয়া যাহা পাইয়াছি তাহা আমাদের রক্তে মাংসে অস্থিমজ্জায়, তাহা আমাদের মানস-প্রকৃতির তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পাই না তাহাকে লাভ বলিয়া মনেই করি না--এই জন্য পাঠশালায় পড়া মুখস্থ করিয়া যাহা অগভীরভাবে অল্পপরিমাণে ও ক্ষণস্থায়ীরূপেও পাই তাহাকেও আমরা বেশি না মনে করিয়া থাকিতে পারি না। মাথার ভারকে আমরা ভারী বলিয়া জানি না, কিন্তু মাথার উপরকার পাগড়িটাকে একটা কিছু বলিয়া স্পষ্ট বোঝা যায়, তাই বলিয়া এ কথা বলা সাজে না যে, মাথা বলিয়া জিনিসটা নাই পাগড়িটা আছে ; সে পাগড়ি বহুমূল্য রত্নমাণিক্যজড়িত হইলেও এমন কথা বলা সাজে না। সেই জন্য আমরা বিদেশ হইতে যাহা পাইয়াছি দিনরাত্রি তাহাকে লইয়া ধ্যান করিলে এবং প্রচার করিলেও, তাহাকে আমরা সকলের উচ্চে চড়াইয়া রাখিয়া দিলেও, আমার

অগোচরে আমার প্রকৃতির গভীরতার মধ্যে নিঃশব্দে আমার চিরন্তন সামগ্রীগুলি আপন নিত্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে। উর্দু ভাষায় যতই পারসি এবং আরবি শব্দ থাক্ না তবু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন তাহা ভারতবর্ষীয় গৌড়ীয় ভাষারই এক শ্রেণী ;--ভাষার প্রকৃতিগত যে কাঠামোটাই তাহার নিত্যসামগ্রী, যে কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির কাজ চলে সেটা বিদেশী সামগ্রীতে আদ্যোপান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া তবুও গৌড়ীয়। আমাদের দেশের ঘোরতর বিদেশীভাবাপন্নও যদি উপযুক্ত তত্ত্ববিদের হাতে পড়েন তবে তাঁহার চিরকালের স্বজাতীয় কাঠামোটা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রচুর আবরণ আচ্ছাদনের ভিতর হইতে ধরা পড়িয়া যায়।

যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না ; নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় এ কথা কখনোই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।